ISSN 2519-6030

উত্তরা ইউনিভার্সিটি

# লেখনী

## ভাষা,সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক জার্নাল

Lekhani : A Journal of Language, Literature and Culture

প্রথম সংখ্যা, মাঘ ১৪২৩
Volume 1, January 2017

শিপ্রা সরকার*

# রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও শিক্ষাচিন্তার স্বরূপ

**সারসংক্ষেপ :** *সত্য-শিব-সুন্দরের পূজারী রবীন্দ্রনাথ বিশ্বব্যাপী পরম এক আধ্যাত্মিক শক্তিতে ছিলেন গভীরভাবে বিশ্বাসী। তাঁর জীবনদর্শন ও জগৎভাবনার মূলে ছিল উপনিষদ। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের প্রগাঢ় সম্পর্কের কথা রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। পৃথিবীর সকল মানুষের ওপর তাঁর ছিল সমান দৃষ্টি। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিগূঢ় সম্পর্ক-বিষয়ক প্রত্যয় রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তাতেও তাঁর এই প্রকৃতিচেতনার ছায়াপাত ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়কে মানব-সংস্কৃতি অনুশীলনের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবি। শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল কবি-প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে ঔপনিবেশিক শাসক-প্রবর্তিত প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শান্তিনিকেতন। এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের ঔপনিবেশবাদ-বিরোধী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সৃজনশীল শিক্ষাদর্শন।*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত একজন রোমান্টিক কবি। কিন্তু মানবজীবনের এমন কোনো প্রান্ত নেই, যেখানে তাঁর চিন্তার স্পর্শ না পড়েছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববীক্ষায়। দার্শনিক চিন্তাধারার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভাববাদী (Idealist)। সত্য-শিব-সুন্দরের পূজারী রবীন্দ্রনাথ বিশ্বব্যাপী পরম এক আধ্যাত্মিক শক্তিতে ছিলেন গভীরভাবে বিশ্বাসী। তাঁর জীবনদর্শন ও জগৎভাবনার মূলে ছিল উপনিষদ। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের প্রগাঢ় সম্পর্কের কথা রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। পৃথিবীর সকল মানুষের উপর তার ছিল সমান দৃষ্টি। অর্থনীতি বা রাজনীতি নয়, তাঁর আন্তর্জাতিকতাবাদের মৌল ভিত্তি ছিল আধ্যাত্মিকতা। ভারত উপমহাদেশে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ব-নাগরিক। তাঁর বিশ্বাত্মবোধের মধ্যে জাত-পাতের কোনো প্রভেদ ছিল না। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মানবকল্যাণচেতনাই ছিল তাঁর সাহিত্য ও কর্মের কেন্দ্রীয় প্রাণশক্তি। রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেম ও অধ্যাত্মচেতনা পরস্পর পরিপূরক। মানুষের মাঝেই তিনি উপলব্ধি করেছেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব, মানুষকেই বসিয়েছেন দেবতার আসনে, উচ্চারণ করেছেন মানবচেতনার এই অম্লান বাণী–'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'। লাঞ্ছিত বঞ্চিত পতিত অসহায় মানুষের কথা তিনি পৌনঃপুনিক বলেছেন তাঁর গদ্যে-পদ্যে-নাটকে। রবীন্দ্রনাথ কেবল একজন রোমান্টিক সাহিত্যিক নন; তিনি বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী লেখকও বটে।[১]

---

*সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

দীর্ঘ জীবনের সাহিত্য ও কর্মসাধনায় মানুষের মনকে সকল প্রকার যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসের হাত থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সমাজের যে-সব ক্ষেত্রে বুদ্ধির উদ্বোধন কিংবা মূঢ়তার পরাভব লক্ষ করেছেন, তা-ই তিনি পাঠকের সামনে সোৎসাহে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। মানুষের জাগরণ বলতে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন মানুষের মোহমুক্ত বুদ্ধির জাগরণ, ক্ষুদ্র সংকীর্ণ নিষেধের শাসন থেকে মুক্তি, অনৈক্যবোধ থেকে মুক্তি।[২] বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম ও বিশ্বমৈত্রীবোধ পরস্পর সংযুক্ত। এই মানবধর্ম ও বিশ্বমৈত্রীবোধই রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের কেন্দ্রীয় পরিচয়-সূত্র। সাহিত্যে, মননে, কর্মে, ধর্মোপলব্ধিতে, সমাজসেবায় যতই বাঙালি সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছে, ততই পশ্চিম-পৃথিবীর সঙ্গে তার সংযোগ ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের এই সংযোগবাসনা রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও জগৎভাবনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় 'কালান্তর' প্রবন্ধে উচ্চারিত রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি–

> তাই ভেবে দেখলে দেখা যাবে, এই যুগ য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের গভীর সহযোগিতারই যুগ। বস্তুত, যেখানে তার সঙ্গে আমাদের চিত্তের, আমাদের শিক্ষার অসহযোগ, সেইখানেই আমাদের পরাভব। এই সহযোগ সহজ হয়, যদি আমাদের শ্রদ্ধায় আঘাত না লাগে। পূর্বেই বলেছি, য়ুরোপের চরিত্রের প্রতি আস্থা নিয়েই আমাদের নবযুগের আরম্ভ হয়েছিল; দেখেছিলুম জ্ঞানের ক্ষেত্রে য়ুরোপ মানুষের মোহমুক্ত বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করেছে এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বীকার করেছে তার ন্যায়সংগত অধিকারকে। ('কালান্তর')

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনে মানবকল্যাণচেতনা ও বিশ্বজাতীয়তার ধারণা যে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা বোঝা যায় ১৯৩০ সালে লেখা তাঁর একটি প্রবন্ধ থেকে। "পথে ও পথের প্রান্তে" শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন– 'বিশ্বজাতীয়তার উদ্যম সঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে জেনিভায়। লীগ অফ নেশনে ঠিক সুর বাজে নি–হয়ত বাজবেও না–কিন্তু আপনা আপনিই ওই শহর সমস্ত জগতের মহানগরী হয়ে উঠছে। যাদের প্রকৃতি বিশ্বপ্রাণ তারা আপনা আপনি ঐখানে এসে মিলবে। ঐ ক্ষেত্রে বর্তমান যুগের একটা মহাকল্যাণ শক্তির উদ্‌বোধন ঘটছে বলে আমার বিশ্বাস।' বৃহৎ বিশ্বের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে বিশ্বমানবতায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন, তার অব্যর্থ প্রমাণ পাওয়া যায় উপর্যুক্ত উদ্ধৃতাংশে। রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনায় মানবচেতনা কীভাবে বিকশিত হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমালোচক লিখেছেন–

> জাগরণের অর্থ যদি এই হয় যে ক্ষুদ্রের ও সংকীর্ণের বন্ধন থেকে মুক্তি, তাহলে স্বীকার করতে হয় রবীন্দ্রনাথ চল্লিশ থেকে সত্তর–জীবনের এই তিরিশ বৎসর কেবলই বেড়া ভেঙেছেন, নিজেকে বারবার অতিক্রম করেছেন, বৃহৎ থেকে বৃহত্তরে যাত্রা করেছেন। প্রথম যৌবনের জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেম, তারপর উপনিষদবাদ, তারপর তপোবন ও আনন্দবাদ, ব্রাহ্মসমাজ-নির্দিষ্ট ব্রহ্মোপসনা, জীবনে ও কর্মে ব্রহ্মোপলব্ধির সাধনা–সবই রবীন্দ্রনাথ অতিক্রম করেছেন, শেষ পর্যন্ত মানব-ঐক্যবোধে উপনীত হয়েছেন। সত্যের রূপ ও প্রেরণা বারবার পরিবর্তিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত বিশ্বমানবতায় পৌঁছেছে–রবীন্দ্রনাথের এই শেষ ও সর্বোত্তম সত্যোপলব্ধি। রবীন্দ্রনাথ শেষদিকে গল্প-কবিতা-উপন্যাস ও ছবিতে যেরকম দেশকালের গণ্ডিকে অতিক্রম করে মননপন্থী ও অমূর্তপন্থী হয়ে উঠেছিলেন, সমাজচিন্তা তথা মানবচিন্তার ক্ষেত্রেও সেইরূপ অগ্রসর হয়েছিলেন।[৩]

চিরায়তকালের মানবসত্যকে রবীন্দ্রনাথ কখনো প্রচলিত ধর্মগ্রন্থে বা আচার-অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষ করেন নি, বরং একে তিনি সন্ধান করেছেন ব্রাত্য-মানুষের চিত্তলোকের অমেয় অতুল অপরিসীম ঐশ্বর্যের মাঝে। মানবমহিমার বন্দনাই রবীন্দ্রনাথের মানবচেতনার মূল কথা নয়, বরং তাঁর মূল লক্ষ্য মানবাত্মার উদ্বোধন।

'পত্রপুট' কবিতায় আছে রবীন্দ্রনাথের এই স্বকীয় মানবচেতনার পরিচয়, যা পরোক্ষে তাঁর প্রাতিস্বিক জীবনাদর্শেরই পরিচায়ক–

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষের আমার অন্তরতম আনন্দে ।
('পত্রপুট')

–বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের মানবচেতনা এই পরম সত্যোপলব্ধির দিব্যবিভায় প্রোজ্জ্বল, শাশ্বতবোধে উজ্জ্বল, চিরায়ত মাঙ্গলিক চেতনায় দীপ্যমান ।

রবীন্দ্রনাথের এই মানবচেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর সমাজচেতনায় । বিশ্বমানবমুক্তির ঐকাগ্র্য আকাঙ্ক্ষাই তাঁর সমাজচেতনার কেন্দ্রীয় প্রত্যয় । রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন–'মানুষের মধ্যে স্বার্থগত আমির চেয়ে যে বড়ো আমি, সেই আমির সঙ্গে সকলের ঐক্য, তার কর্ম সকলের কর্ম । একলা আমির কর্মই বন্ধন, সকল আমির কর্ম মুক্তি ।' এই প্রত্যয়ে স্থিত থেকে রবীন্দ্রনাথের সকল কর্ম, তাঁর আদর্শবাদী চিন্তা, বৈপ্লবিক সংগ্রাম এবং সমাজকল্যাণ চিন্তা একটি বিন্দুতে সংহতি লাভ করেছিল । মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে রবীন্দ্রনাথ সমাজজীবনের অংশ হিসেবেই বিবেচনা করেছেন । তিনি মানুষকে বিচার ও মূল্যায়ন করেছেন তার সমগ্র জীবন দেশ সমাজ ও সভ্যতার পটভূমিতে স্থাপন করে । মানুষের সামাজিক অস্তিত্বকে তিনি গভীরভাবে স্বীকার করেছেন । প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সদর্থক উপাদানগুলো তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং বাঙালি জনগোষ্ঠীর জন্য সামঞ্জস্যময় এক সমাজের কথা চিন্তা করেছেন । সমগ্র জীবন ধরে এবং বিপুল সাহিত্যকর্মে তিনি যে মানুষের কথা বলেছেন, সে-মানুষ কোন ব্যক্তিমানুষ নয়, গুণে-কর্মে-সাধনায় পূর্ণাঙ্গ সামাজিক মানুষ । বস্তুত, মানুষের পুঞ্জীভূত মানবিক গুণের সমাহার দিয়ে সামাজিক মানুষের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষাই ছিলো রবীন্দ্রনাথের সমাজদর্শনের মূল কথা ।[৪]

দীর্ঘ আশি বছরের জীবনবৃত্তে উপমহাদেশের প্রায় প্রতিটি সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছেন । কোনো কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগ ছিল অতি নিবিড় ও প্রত্যক্ষ । 'সোনার তরী' কাব্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন–'মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল । তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি' ; সেই সংকল্পের সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন এই সত্যোপলব্ধি–

আজ আমি বলিতেছি, ভারতবর্ষের দীনতম কৃষককেও আমি ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিব, আর ওই যে রাঙা সাহেব টম্‌টম্ হাকাইয়া আমার সর্বাঙ্গে কাদা ছিটাইয়া চলিয়া যাইতেছে, উহার সহিত আমার কানাকড়ির সম্পর্ক নাই। ('ইংরাজ ও ভারতবাসী')

রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শ গঠনে তাঁর বাল্যের পরিবেশ, পারিবারিক ঐতিহ্য ও সমকালীন প্রেক্ষাপট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য রবীন্দ্র-গবেষক সৈয়দ আকরম হোসেনের এই বিবেচনা–'ঐতিহ্যপুষ্ট রবীন্দ্রপ্রতিভাশক্তি পরিবেশ-পরিপ্রেক্ষিত সূত্রে যেমন সর্বভারতীয় ঐতিহ্যের গভীরতম স্তরে রসগ্রাহী শিকড় সঞ্চারে সক্ষম হয়েছিল ; ঠিক তেমনি নব্য ইয়োরোপীয় গণতান্ত্রিক কর্মবাদী সভ্যতা ও শিল্প-সংস্কৃতির বিস্তৃত এলাকায় পত্রল শাখা-প্রশাখা প্রসারিত করে শক্তি সংগ্রহে ছিল স্বচ্ছন্দচারী। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিক্ষমপ্রজ্ঞা পারিবারিক বিচিত্রমুখী শিল্পসাধনার সদা উদ্যম তপস্যা ও সৃষ্টিশীল আবহওয়া থেকে পুষ্পিত হওয়ার অন্তরাবেগ সঞ্চয়ে সমর্থ হয়েছিল।'[৫] রবীন্দ্রনাথের পরিবারের সদস্যবৃন্দ সমকালীন সময়ে সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধনে যে ভূমিকা রেখেছিলেন, তার প্রভাব পড়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনা ও শিক্ষাচিন্তায়। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় সমকালীন প্রেক্ষাপট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত ভাষ্য–

I was born in what was then the metropolic of British rule. My ancestors came floating to Calcutta upon the earliest tide of the East India Company. The conventional code of life for our family thereupon became a confluence of three cultures : The Hindu, the Mohammedan and the British,_ the all-pervading fact around my boyhood being the modern city, newly built by a company of Western traders, and the spirit of the modern time seeking its unacconstomed path into our life, stumbling against countless anomalies.[6]

সর্বমানবের প্রতি, সর্বজীবের প্রতি, জীবনের প্রতি অসীম মমত্ববোধ, প্রকৃতির সঙ্গে তার নিগূঢ় আত্মীয়তা, জাতি ও সমাজের প্রতি তার কর্তব্যবোধ, এই সবই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনদর্শনের সারকথা। এই চৈতন্যময় বিশ্ববোধের ধারণা তাঁর সমস্ত ভাবনা ও কর্মকে আচ্ছন্ন করেছিল। উপনিষদের ঋষিদের মতো রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনা ছিল মহাচৈতন্যকে আপনার মধ্যে উপলব্ধি করার সাধনা, আপনাকে ব্যাপ্ত চৈতন্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়ার আরাধনা। স্মরণ করা যায় তাঁর আত্মভাষ্য– 'এই যে বাধাহীন চৈতন্যময় বিশ্ববোধটি অত্যন্ত সত্য হয়ে উঠেছিল এই কথাটি আজ আমরা যেন সম্পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি। এই কথাটি স্মরণ করে আমাদের বক্ষ যেন প্রশস্ত হয়, আমাদের চিত্ত যেন আশান্বিত হয়ে ওঠে। যে বোধ সকলের চেয়ে বড় সেই বিশ্ববোধ, যে লাভ সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্মলাভ–কাল্পনিকতা নয়।' (*শান্তিনিকেতন*)।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিগূঢ় সম্পর্ক-বিষয়ক প্রত্যয় রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তাতেও তাঁর এই প্রকৃতিচেতনার ছায়াপাত ঘটেছে। দার্শনিক হেগেলের মতো রবীন্দ্রনাথও মানুষ প্রকৃতির পারস্পরিক সম্বন্ধটিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের চোখে মানুষ ও প্রকৃতি, জীবন ও মৃত্যু এসব পরস্পর পরিপূরক। রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে আবিষ্কার করেছেন গভীর এক ঐক্যসূত্র। এই বোধ রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের বিশিষ্ট এক প্রান্ত। এই ঐক্যবোধের অভাব আছে বলে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন। মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট' কাব্য সমালোচনা-সূত্রে তিনি এই ঐক্যবোধের অভাবের কথা বলেছেন, শনাক্ত করেছেন জীবের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদের প্রান্ত–'মিল্টনের *Paradise Lost* এ কাব্যে আদি মানব-দম্পতির স্বর্গারণ্যে বাস বিষয়টি এমন যে, অতি সহজেই সেই কাজে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলনটি সরল প্রেমের সম্বন্ধে বিরাট ও মধুর হয়ে প্রকাশ পাবার কথা। কবি প্রকৃতি-সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন। জীব-জন্তুরা সেখানে হিংসা পরিত্যাগ করে একত্রে বাস করছে, তা-ও বলেছেন, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তাদের কোন সাত্ত্বিক সম্বন্ধ নেই। এই যে নিখিলের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ, এর মূলে একটি গভীরতর বিচ্ছেদের কথা আছে। এর মধ্যে 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ', জগতে যা কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা সমাবৃত করে জানবে, এই বাণীটির অভাব আছে' (শিক্ষা)। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বচরাচরকে এক মহৎ প্রাণের দ্বারা সমাবৃত করে দেখেছিলেন। সর্বপ্রাণনা ও প্রাণপ্রৈতির উৎস যিনি, তিনিই এই বিশ্বপ্রাণের অধিশ্বর। রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বপ্রাণেরই লীলা ও প্রকাশ দেখেছেন এই ভুবনে এবং ভুবনান্তরে।[৭] জগতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন অবিমিশ্র এক সংযোগ; বলেছেন এই কথা–'বাল্যকাল থেকে অতি নিবিড়ভাবে আনন্দ পেয়েছি বিশ্বদৃশ্যে।' 'বনবাণী' কবিতাতে আছে রবীন্দ্রনাথের এই জীবনাদর্শের পরিচয়–

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে,
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে,
প্রভাত সন্ধ্যার
আলো অন্ধকার
মোর চেতনায় গেছে ভেসে,
অবশেষে
এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন
আর আমার ভুবন।
ভালোবাসিয়াছি এই জগতের আলো,
জীবনেরে তাই বাসি ভালো।।

('বনবাণী')

মধুময় দ্যুলোকে-ভূলোকে রবীন্দ্রনাথের অবিশ্রাম সঞ্চরণ। পৃথিবীর পাশবিক রূপগুলোকে রবীন্দ্রনাথ কখনো বড় করে দেখেন নি কিংবা দেখান নি; তাঁর কাছে সব সময় প্রাধান্য পেয়েছে পৃথিবী ও প্রকৃতির চিন্ময় সত্তা। এক চৈতন্যময় বিশ্ববোধের ধারণা সত্য হয়ে দেখা দেয় রবীন্দ্র-জীবনদর্শনে।

এতকাল যা ছিল একান্তই তত্ত্বকথা, এবার তা মূর্ত হয়ে উঠলো রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের বৃহত্তর পরিধিতে এসে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিবোধের স্পর্শে জীবন ও দর্শন একাকার হয়ে মিলে গেছে, তাঁর কাছে এসে ঘুচে গেছে মনন ও সাধনের বিপুল পার্থক্য।৮ রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের এই স্বকীয়তার আলোকেই গড়ে উঠেছে তাঁর প্রাতিস্বিক শিক্ষাচিন্তা। বিশ্বাত্মবোধের অনুপম এক ব্যঞ্জনা তাঁর শিক্ষাচিন্তার মর্মকোষে সদা প্রবাহিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম তিনি যখন রাখেন 'বিশ্বভারতী', তখন সহসাই আমরা সেখানে খুঁজে পেতে পারি রাবীন্দ্রিক বিশ্ব-চেতনার নির্ভুল পরিচয়।

## রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন। দার্শনিক চিন্তার দিক থেকে তিনি ছিলেন ভাববাদী (idealist), আবার প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার বাণী-সূত্রে তাঁকে প্রকৃতিবাদী (naturalist) বলেও আখ্যায়িত করা যায়। অপরদিকে কর্মসূত্রে তিনি ছিলেন একান্তই প্রয়োগবাদী (pragmatist)। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনে এই তিন প্রবণতারই প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নোক্তভাবে শনাক্ত করা যায়–

## মানুষ ও প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ক

রবীন্দ্রনাথের মতে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে এর বিচ্ছিন্নতা। রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে বিশ্বাস করেন, প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে রয়েছে এক নিবিড় আত্মীয়তা-বন্ধন। তিনি বিশ্বাস করেন, প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে শিক্ষার্থীর দেহমন সুগঠিত হয় এবং ক্রমে সে পরমসত্তাকে উপলব্ধি করতে শেখে। তাই প্রাচীন ভারতীয় তপোবনধর্মী শিক্ষার আদর্শে তিনি স্থাপন করেছেন তার অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতন। শান্তিনিকেতনে শিক্ষার্থীর সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক ছিল যেমন সহজ, তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত।

## সর্বভারতীয় আদর্শ ও বাঙালি সংস্কৃতি

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অনুপম সমন্বয়চিন্তার প্রতিফলন বিশেষভাবে লক্ষযোগ্য। কিন্তু তার শিক্ষাদর্শনে এই সমন্বয়চিন্তার তেমন প্রভাব পড়ে নি। বস্তুত, তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনায় কোনো বিদেশি ভাবনা অনুকরণের প্রচেষ্টা নেই। তিনি ভারতীয় ঐতিহ্য এবং বাঙালি সংস্কৃতিতে গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিলেন এবং এই দুই উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তা শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। যে শিক্ষা দেশজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে শিক্ষার্থীকে উন্মুলিত করে, রবীন্দ্রনাথ সে-শিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন।

## শিক্ষা কার্যক্রমে বিজ্ঞানমনস্কতা

শিক্ষা-পরিকল্পনায় ভারতীয় ঐতিহ্য ও বাঙালি সংস্কৃতিকে নিবিড়ভাবে আঁকড়ে থাকলেও পশ্চিমা বিজ্ঞানচেতনাকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। এক্ষেত্রে তিনি প্রাচ্য সংস্কৃতি এবং প্রতীচ্য বিজ্ঞানকে সমন্বিত করার পক্ষপাতী ছিলেন। পাশ্চাত্য থেকে বিজ্ঞানের যে জ্ঞানভাণ্ডার ভারতে এসেছে, শিক্ষাক্রমে (curriculum) তা তিনি আগ্রহের সঙ্গেই অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শিক্ষা-পরিকল্পনায় আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষাকে তিনি সর্বদা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন।

**মানবপ্রেম**

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মানবপ্রেমভাবনা। মানুষের মধ্যে কৃত্রিম অসমতাকে তিনি কখনোই স্বীকার করেন নি। সকল মানুষের প্রতিই ছিল তাঁর গভীর ভালোবাসা। রবীন্দ্র-জীবনদর্শনে যেমন মানবচেতনার বিশিষ্ট আসন আছে, তেমনি তাঁর শিক্ষাদর্শনেও আছে মানবচেতনার প্রতিফলন। উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ সকলকেই তিনি সমান জ্ঞানে বিচার করেছেন। এই মানবচেতনা তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় নিয়ে এসেছে ঐক্য, সংহতি ও সাম্যের ধারণা।

**স্বাধীনতা স্পৃহা**

রুশো, ফ্রয়েবেল ও ডিউইর মতো রবীন্দ্রনাথও স্বাধীনতা ও আনন্দের মধ্য দিয়ে শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। কঠোর শাসন ও নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে শিশুকে কাজের অবাধ স্বাধীনতা দিলে শৃঙ্খলা রক্ষায় কোন সমস্যা থাকবে না, বরং তার চিন্তা ও বিচারশক্তির উন্মেষ ঘটবে–একথা রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন।[৯]

**সৌন্দর্যানুভূতি**

রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে সুন্দরকে কামনা করেছেন, তিনি ছিলেন সুন্দরের একজন শ্রেষ্ঠ উপাসক। তাই তাঁর মতে, শিক্ষা যাতে শিক্ষার্থীর চেতনায় সৌন্দর্যবোধ জাগ্রহ করে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। বিশ্বে যে সৌন্দর্যানুভূতির আনন্দধারা নিত্য প্রবাহিত হয়ে চলেছে, শিক্ষার্থীকে তার সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়াকে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার প্রধান কাজ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

**নারীশিক্ষা**

নারীশিক্ষার ধারণা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের মতে নারী-পুরুষের শিক্ষার সমান অধিকার থাকা প্রয়োজন। নারীকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পরিবারের প্রয়োজন, গৃহস্থালী, স্বাস্থ্য ও সন্তান-পরিচর্যা–এসব দিক নারীশিক্ষা-পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তির কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। গৃহ ও গৃহের পার্শ্ববর্তী পরিবেশ সম্পর্কেও নারীকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। এছাড়া পরিবারের আয় বৃদ্ধির জন্য পল্লির নারীদের বৃত্তিমূলক কিংবা কুটির শিল্পধর্মী কাজে প্রশিক্ষণ গ্রহণ জরুরি বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। মোটকথা, নারীশিক্ষার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল বেশ স্বচ্ছ ও উদার।

**আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশ**

শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশের কথা রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। শিক্ষাক্রমে এমন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যাতে শিক্ষার্থীর আত্মচেতনা জাগ্রত হয়। এ জন্য তোতাকাহিনী-নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনি বর্জন করার কথা বলেছেন; পরিবর্তে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন আত্মবিকাশধর্মী আনন্দময় শিক্ষাব্যবস্থা। তিনি মনে করতেন, শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাক্রম এমন হবে যাতে শিক্ষার্থীর সৃজনী প্রতিভা বিকাশের সুযোগ ঘটে। তাঁর মতে প্রকৃতির সাহচর্যে অঙ্কন, বাঁশ ও মৃৎশিল্প, ভাস্কর্য প্রভৃতি সৃজনমূলক কাজে শিক্ষার্থীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই কেবল সঞ্চারিত হয় না, তার মনেরও যথেষ্ট বিকাশ ঘটে। এ ধরনের সৃজনধর্মী কাজ শিক্ষার্থীকে পড়ালেখার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করে, তাকে করে তোলে স্বপ্নচারী।

## শিশু-শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তায় শিশু-শিক্ষার্থীরা সবিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। শিশুদের জন্য তিনি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাদের শিক্ষাক্রম নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর সার্বিক বিকাশের পথ সৃষ্টির উপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, শিশু-শিক্ষার প্রধান কাজ হবে শিশুর দেহমন ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন। শিশুদের শিক্ষাক্রমে,বইয়ের বোঝা না চাপিয়ে, তাদের প্রকৃতিসংলগ্ন করে আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা রবীন্দ্রনাথ পৌনঃপুনিক উচ্চারণ করেছেন।

## রবীন্দ্রনাথ ও শিক্ষার লক্ষ্য

লর্ড মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার কঠোর সমালোচক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। লর্ড মেকলের তথা ইংরেজ আমলের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কাজ-চালানোর মতো ইংরেজি-জানা কিছু কেরানী সৃষ্টি করা, যারা ইংরেজ সিভিলিয়ান ও দেশীয় লোকদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে। মেকলের বক্তব্য থেকেই অনুধাবন করা যায় ইংরেজ শাসকদের শিক্ষানীতির মৌল উদ্দেশ্য। নিজেদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে ঔপনিবেশিক শাসক মেকলে লিখেছেন–

> We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals and in intellet.[১০]

–মেকলের শিক্ষানীতির এই প্রক্রিয়া বাংলার মধ্যশ্রেনিকে জন্মসূত্রেই স্বদেশ-স্বজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে দূরসঞ্চারী ভূমিকা পালন করেছে। সমকালে, ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত হওয়ায় অর্থই ছিল স্বদেশ-স্বজাতি-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। বিদ্যা ও বিত্তের বিকৃত বিকাশ নব-উদ্ভূত মধ্যশ্রেণির চেতনায় কেবল পরিবার-সমাজ আর ঐতিহ্যবিচ্ছিন্নতাই সৃষ্টি করে নি, তা জন্ম দিয়েছিল গভীর মানসিক বিচ্ছিন্নতাও।[১১]

ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসক-প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার এই দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা ও অসৎ উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা বর্জন করে প্রবর্তন করতে চেয়েছেন নিজস্ব এক শিক্ষাপদ্ধতি। রবীন্দ্রনাথের মতে, কেরানি সৃষ্টি করা নয়, বরং শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ সৃষ্টি করা। রবীন্দ্রনাথের মতে প্রকৃত মানুষ সৃষ্টি করাই হবে শিক্ষার মূল লক্ষ্য। সামাজিক গুণাবলি অর্জনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির আত্মচেতনার বিকাশ সাধনই, রবীন্দ্রনাথের মতে, শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তি ও সমাজকে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। বস্তুত, তিনি শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক ও ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। নিচে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত সূত্রকারে উপস্থাপিত হলো–

১. বৌদ্ধিক বিকাশ : শিক্ষা অজ্ঞানতা দূর করে, ত্বরান্বিত করে মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশ। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশ হয় না বলেই রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। পুথিভিত্তিক জ্ঞান অর্জন ও প্রচলিত পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার কঠোর সমালোচক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মতে, স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশই হবে শিক্ষার লক্ষ্য। তিনি লিখেছেন–'যে শিক্ষা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত ও সক্রিয় করে, আমাদের মনকে অবুদ্ধির প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারে, সেই শিক্ষার দ্বারাই আমাদেরও সমস্ত দুঃখ-দুর্গতির অবসান ঘটতে পারে।' (শিক্ষা)

২. বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ : শিক্ষার্থীর মনে কৌতূহল ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত করা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত হলেই একজন শিক্ষার্থী জীবন ও জগতের রহস্য আবিষ্কারে উদ্যোগী হবে, তার চেতনা থেকে দূর হবে অজ্ঞানতা অন্ধকার ও কুসংস্কার।

৩. দৈহিক বিকাশ : শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশ যাতে স্বাভাবিকভাবে হয়, সে-দিকে শিক্ষার লক্ষ্য থাকা উচিত বলে রবীন্দ্রনাথ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পাঠের বোঝা বইতে গিয়ে এদেশের শিক্ষার্থীরা যে স্বাস্থ্য-সম্পদ হারিয়েছে, তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বেদনার অন্ত ছিল না। তাই তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের দৈহিক স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে বলেছেন। শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশ ও আনন্দময় পাঠের জন্য তিনি তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনায় মুক্ত পৃথিবীর বুকে খেলাধুলা, নৃত্য-গীত ইত্যাদি আয়োজনের কথা বলেছেন।

৪. নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ : রবীন্দ্রনাথের মতে যে সর্বব্যাপী পরমসত্তা ছায়ার মতো আমাদের সহগামী, তাকে উপলব্ধি করাই হলো সকল প্রকার শিক্ষার কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য। তাই আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি শান্তিনিকেতনের শিক্ষা-পরিকল্পনায় প্রাধান্য পেয়েছে। ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের জন্য শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন–'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার / চরণ ধূলার তলে।' রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ সাধিত হলেই মানুষ জীবন ও জগৎকে পূর্ণরূপে আবিষ্কার করতে পারবে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় তাঁর নিম্নোক্ত ভাষ্য–

> আমি আশ্রমের আদর্শ রূপে বার বার তপোবনের কথা বলেছি। সে তপোবন ইতিহাস বিশ্লেষণ করে পাইনি। তা পেয়েছি কবির কাব্য থেকেই। তাই স্বভাবতঃই সেই আদর্শকে আমি কাব্যরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি, বলতে চেয়েছি 'পশ্য দেবস্য কাব্যং', মানবরূপে দেবতার কাব্যকে দেখো। আবাল্য উপনিষদ আবৃত্তি করতে করতে আমার মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে মানতে অভ্যাস করেছে। সে পূর্ণতা বস্তুর নয়, আত্মার। ('তপোবন')

৫. সামাজিক গুণাবলির বিকাশ : রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন সকল মানুষই সমান। মানুষের মাঝেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন পরম ব্রহ্মের অস্তিত্ব। যেহেতু জগতের সবকিছুরই উৎস পরম ব্রহ্ম, তাই রবীন্দ্রনাথের চোখে সবাই সমান। এ কারণেই শৈশব থেকেই শিক্ষার্থীকে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিকতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে বলেছেন। তাঁর মতে, শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যক্তিত্ব ও আত্মচেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক চেতনারও বিকাশ।

রবীন্দ্রনাথের মতে, জীবনের এই পাঁচটি প্রান্তের কোনটিই অপ্রধান নয় ; তাই সবগুলোই শিক্ষার লক্ষ হওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত শিক্ষার এই লক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি তাঁর শিক্ষাদর্শনে দ্বিমাত্রিক সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। একদিকে শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় ঘটাবে; অন্যদিকে, শিক্ষা ব্যক্তির সমস্ত রকম বিকাশ ঘটিয়ে সামাজি উন্নয়নে সহায়তা করবে।[১২] পাশ্চাত্য শিক্ষাদার্শনিকদের শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের এখানেই পার্থক্য। পাশ্চাত্যের কোনো শিক্ষাদার্শনিক এত ব্যাপক ক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে শিক্ষা লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারেন নি। তাই রবীন্দ্রনাথকে কেবল ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সমন্বয় সাধক বললে বা কেবল ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ ও পাশ্চাত্য বস্তুবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধক বললে ভুল হবে। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ, বস্তুবাদ, সমাজতান্ত্রিক মতবাদ, ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদ, উপযোগিতাবাদ সবকিছুর মধ্যে মহা ঐক্য স্থাপন করেছেন, যে ঐক্য একজন শিক্ষার্থীকে প্রকৃত মানুষ করে তুলবে, তাকে করে তুলবে মানবসম্পদ তথা মানবিক পুঁজি। মানুষকে শিক্ষার মাধ্যমে মানবিক পুঁজিতে রূপান্তরের এই প্রয়াসই রবীন্দ্রনাথের যুগান্তকারী শিক্ষাদর্শনের পরম লক্ষ্য।

**রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শন : পাঠক্রম**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীর জীবনের সব প্রান্তকে স্পর্শ করে এমন পাঠক্রম রচিত হওয়া উচিত। তিনি পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামনে সংস্কৃতির পরিপূর্ণ রূপটি তুলে ধরতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়কে মানব-সংস্কৃতি অনুশীলনের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাই পাঠক্রমে সেই সব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিত্তে মানবসংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি হয়। তিনি তাঁর প্রস্তাবিত পাঠক্রমের মধ্যে ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সঙ্গীত, নৃত্য, পরিবেশ, পল্লি-উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, কুটির শিল্প এবং বেশ কিছু সামাজিক কাজকে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। শিক্ষার্থীদের ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করার মানসে রবীন্দ্রনাথ *রামায়ণ ও মহাভারত*-কে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্তির কথা বলেছেন।

সভ্যতার অগ্রগতির জন্য বিজ্ঞানের জ্ঞানকে আত্মস্থ করা প্রয়োজন বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। শিক্ষার্থীদের চেতনায় বিজ্ঞান দৃষ্টি বিকাশের জন্য তিনি বিজ্ঞানের নানা বিষয়কে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্তির পরামর্শ দিয়েছেন। অপরদিকে জীবনের মূল্যবোধ বিকাশের জন্য দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাও তিনি অনুভব করেছেন। এ কারণেই শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞান ও দর্শন উভয় বিষয়কেই তিনি অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষার্থীরা যাতে বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে, সেজন্য প্রকৃতি-পাঠও তাঁর শিক্ষাক্রমে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। শিক্ষার্থীর চিত্তে নন্দনতাত্ত্বিক কৌতূহল জাগরণের জন্য তিনি শিল্পকলাকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। একই উদ্দেশ্যে সঙ্গীত ও নৃত্যকলাকে তিনি স্থান দিয়েছেন পরিকল্পিত পাঠক্রমে। রবীন্দ্রনাথের পাঠক্রমে স্বদেশের ইতিহাসচর্চা একটা বড় জায়গা পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাক্রম ধারণার একটি উল্লেখযোগ্য দিক পল্লি-উন্নয়নভাবনা। শিক্ষার্থীরা যাতে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় সামাজিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে, সেজন্য শিক্ষাক্রমে সমাজসেবা ও পল্লি-উন্নয়নমূলক কাজের ব্যবস্থা রাখার পক্ষপাতী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বর্তমান কালে কর্ম-অভিজ্ঞতা (work-experience) এবং সৃজনধর্মী উৎপাদনাত্মক কাজের কথা শিক্ষাক্রম প্রণেতারা বিশেষভাবে বলে থাকেন। কিন্তু ভাবতে বিস্ময় জাগে, শতবর্ষ পূর্বেই স্বরচিত শিক্ষাক্রমে রবীন্দ্রনাথ ওইসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের শিক্ষাক্রমে বই-বাঁধাই, কাঠের কাজ, মৃৎশিল্প, অঙ্কন, তাঁতের কাজ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। বস্তুত, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাক্রম ছিল অভিজ্ঞতা, অধীত জ্ঞান ও কর্মভিত্তিক।

শিক্ষার মাধ্যমে হিসেবে মাতৃভাষার কথা বরীন্দ্রনাথ পৌনঃপুনিক উচ্চরণ করেছেন। তিনি লিখেছেন - 'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ।' তিনি ইংরেজি শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। বরং ঐতিহ্যের সঙ্গে সংলগ্ন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার কথা বিশেষভাবে বলেছেন। তিনি বারবার সতর্ক করেছেন এই বলে যে, মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে কেউ-ই প্রকৃত শিক্ষা লাভ করতে পারে না। তাই তাঁর শিক্ষাক্রমে মাতৃভাষা অনুশীলনের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। তাঁর মতে, মাতৃভাষার অনুশীলনের ফলেই শিক্ষার্থীর কল্পনাচারিতা বিকশিত হয়, সে বুঝতে পারে আপন অধিকার, চিনতে পারে নিজেকে।

রবীন্দ্রনাথ-পরিকল্পিত পাঠক্রম কল্পনা এবং বাস্তবের এক নিগূঢ় সমন্বয়। তাঁর শিক্ষাক্রম ছাত্র-ছাত্রীকে তোতাপাখির[১৩] করুণ পরিণতির দিকে ঠেলে দেয় না, বরং তাকে করে তোলে জীবন-মুখী, স্বপ্নমুখী, মানবমুখী ও পরমসত্তামুখী। রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করেছেন, তা বহু বিস্তৃত। শিক্ষার্থীর সামূহিক ও সামগ্রিক বিকাশ সাধনই ছিল রবীন্দ্র-পাঠক্রমের মূল লক্ষ্য।

**রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন: শিক্ষণপদ্ধতি**

রবীন্দ্রনাথ সুনির্দিষ্ট কোনো শিক্ষণপদ্ধতির কথা বলেন নি। তাঁর মতে, শিক্ষক যদি উৎসাহী ও গুণসম্পন্ন হন, তবে প্রয়োজন মতো তিনি নিত্য নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে শিক্ষা দিতে পারেন। কিন্তু প্রচলিত ব্যবস্থায় এরূপ শিক্ষণপদ্ধতি নেই বলে তার তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, শিক্ষণপদ্ধতি সার্বিক পরিস্থিতি ও শিক্ষার্থীনির্ভর হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই শিক্ষণ পদ্ধতিকে, তাঁর মত অনুযায়ী, কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ করা যায় না। উদ্ভাবনধর্মী শিক্ষণপদ্ধতির কথা বলতে গিয়ে তিনি মনুষ্যপ্রকৃতি ব্যাখ্যা করেছেন, লিখেছেন এই কথা–'সুখও তাকে শিক্ষা দেয়; দুঃখও তাকে শিক্ষা দেয়; শাসন নইলেও তাহার চলে না, স্বাধীনতা নইলেও তাহার রক্ষা নাই।' তাই তিনি সুনিদিষ্ট ও সুসংবদ্ধ প্রথাগত কোনো শিক্ষণপদ্ধতি রচনা করেন নি; তবে পদ্ধতি রচনার কতগুলো মৌলিক নীতির উল্লেখ 'করেছেন। শিক্ষণপদ্ধতির ক্ষেত্রে তিনি তিনটি নীতির উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এই নীতিত্রয় হচ্ছে–

(ক) স্বাধীনতার নীতি (Principle of freedom)

(খ) সৃজনশীলতার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের নীতি (Principle of creative self-expression); এবং

(গ) প্রকৃতির সঙ্গে সক্রিয় সংযোগের নীতি (Principle of active communication with nature).

শিক্ষণপ্রক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার্থীদের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, দেহ-মনের স্বাভাবিক বিকাশের জন্যই পূর্ণ স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন। তবে 'স্বাধীনতা' বলতে তিনি স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেন নি। রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বাধীনতার অর্থ হলো আত্ম-কর্তৃত্বের অধিকার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষণপদ্ধতির দ্বিতীয় নীতিতে সৃজনধমী সক্রিয়তা ও উদ্যোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি মনে করেন, স্বাধীন ভাব থেকেই সৃজন-প্রতিভার বিকাশ সম্ভব। তিনি লিখেছেন–'আমরা মন খাটাইয়া সজীবভাবে যে জ্ঞান উপার্জন করি, তাহা আমাদের মনের সঙ্গে মিশিয়া যায়।' কোমলমতি শিশু ও কিশোর-শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করে তোলার জন্য বাগান পরিচর্চার কাজ, লাইব্রেরি গোছানোর কাজ, নাটক রচনা ও অভিনয়, সঙ্গীত ও নৃত্য, বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ – ইত্যাদির উপর তিনি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সবশেষে তিনি এমন এক শিক্ষণপদ্ধতি সৃষ্টির পরামর্শ দিয়েছেন যাতে শিশু, প্রকৃতি এবং সমাজের মধ্যে স্থাপিত হয় এক আত্মিক সম্পর্ক। তিনি প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে রেখে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের কথা বলেছেন। এ উদ্দেশ্যেই তিনি শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তিনি লিখেছেন – 'আমার আশা ছিল যে, শান্তিনিকেতনের গাছপালা, পাখিই এদের শিক্ষার ভাব নেবে।' মানুষের জন্ম বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবসমাজ – এই দুয়ের মধ্যে। তাই এই উপাদানদ্বয়কে শিক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য পরামর্শ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষণপদ্ধতি-বিষয়ক উপর্যুক্ত নীতিসমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করেছিলেন শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক বিদ্যালয়ে।[১৪]

সক্রিয়তা বরীন্দ্রনাথের শিক্ষণপদ্ধতির মূল কথা। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় সক্রিয়তার মাধ্যমে সহজে শেখান যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিল্পশিক্ষা এবং অন্যান্য কাজ (যেমন- গাছে চড়া, ফুল-ফল পাড়া, বাগান পরিচর্যা, সাঁতার কাটা ইত্যাদি) শিক্ষার্থীর দেহমন গঠনে সাহায্য করে। বিদ্যালয়ের চার দেয়ালের মধ্যে শিক্ষদান অপেক্ষা ভ্রমণের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণের সময় মুক্ত প্রকৃতি ও সমাজদ্ধ মানুষের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সংযোগে ঘটে, পর্যটনের ফলে শিক্ষার্থী যে প্রত্যেক অভিজ্ঞতা লাভ করে, বিদ্যালয়ের দেয়াল-ঘেরা কক্ষে তা কখনো সম্ভব হয় না। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

> Children have their active sub-conscous mind which like a tree has the power to gather its food from the surrounding atmosphere. For them atmosphere is a great deal more important than rules, methods, buildings, appliance, class-teaching and text books. (*A poet's school*)

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষণপদ্ধতিতে প্রকৃতির রয়েছে বিশাল ভূমিকা। প্রকৃতির নানা উপাদান তাঁর কাছে শিক্ষাপ্রদাণের উপকরণ বলে বিবেচিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন – শিখবার জন্য চক, বোর্ড, পুঁথি ইত্যাদির মতোই অত্যাবশ্যক উপাদান হিসেবে থাকবে আলো বাতাস গাছাপালা মুক্ত আকাশ ইত্যাদি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেবল প্রকৃতির মাঝে মুক্ত হওয়া নয়, বরং মানবসমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েও আত্মমুক্তি সন্ধানের কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ।[১৫]

প্রসঙ্গত তিনি বলেছেন–

> প্রথমে আমি শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এই উদ্দেশ্যে ছেলেদের এখানে এনেছিলুম যে বিশ্বপ্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে আমি এদের মুক্তি দেব। কিন্তু ক্রমশ আমার মনে হয় যে, মানুষে মানুষে যে ভীষণ ব্যবধান আছে তাকে অপসারিত করে মানুষকে সর্বমানবের বিরাট লোকে মুক্তি দিতে হবে। আমার বিদ্যালয়ের পরিণতির ইতিহাসের সঙ্গে সেই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাটি অভিব্যক্ত হয়েছিল। (শান্তিনিকেতন)

**রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনঃ ছাত্র-শিক্ষক প্রসঙ্গ**

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাদর্শনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সম্পর্কে নানা কথা বলেছেন। শিক্ষা শীর্ষক গ্রন্থে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ককে তিনি এক বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন, আধুনিক কালে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সম্বন্ধটা ক্রমেই অপ্রাকৃত ও শিথিল হয়ে এসেছে। শিক্ষার্থীর অনেক অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে, শিক্ষকেরও অভিযোগের অন্ত নেই। শিক্ষককে একালের শিক্ষার্থী আর শ্রদ্ধা করে না, সম্মান দেখায় না। শিক্ষকও ছাত্রকে সন্তানবৎ স্নেহ করেন না, তার কল্যাণ কামনা করেন না। শিক্ষক আজ অর্থান্বেষী বুদ্ধিজীবী মাত্র– শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সম্বন্ধটুকু আর্থিক লেনদেনের পর্যায়ে নেমে এসেছে। এই অবস্থার অবসান কামনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই তাঁর শিক্ষাদর্শনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী প্রসঙ্গটা গুরুত্বের সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাচিন্তায় শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, শিক্ষকও শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য এক অংশ। শিক্ষকের সেবামূলক মনোভাব একান্ত জরুরি বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। শিক্ষকের মাঝে তিনি প্রত্যাশা করেছেন চিরন্তন জ্ঞানপিপাসা। তাঁর কাছে জ্ঞানই শক্তি। যিনি পরম জ্ঞানী তিনিই অনন্ত শক্তির অধিকারী। শিক্ষকের চিরন্তন জ্ঞানপিপাসা না থাকলে তিনি কিছুতেই শিক্ষার্থীর জ্ঞানচাহিদা মেটাতে পারবেন না। প্রসঙ্গত তিনি লিখেছেন–

A most important truth which we are apt to forget, is that a teacher can never truly teachers unless he is still learning himself. A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame. *(A poet's school)*

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত শিক্ষায় গড়ে তোলার জন্য শিক্ষককে সাত্ত্বিক গুণের অধিকারী হতে হবে। যাদের জাগতিক প্রত্যাশা বেশি, প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা যাদের প্রবল, তাদের এ পথে না আসাই ভালো বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। সমস্ত প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ঊর্ধ্বে উঠে শিক্ষককে জ্ঞান দান করতে হবে। জাগতিক প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকলে জ্ঞানদান কখনোই সুসম্পন্ন হতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন – 'জ্ঞানের আদান-প্রদানের ব্যাপারটি সাত্ত্বিক। তাহা প্রাণকে উদ্বোধিত করে। সেইজন্য এইখানেই প্রাণের নাগাল পাওয়া সহজ। এইখানেই গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্বন্ধ যদি সত্য হয় তবে ইহজীবনে তার বিচ্ছেদ হয় না। তাহা পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধের চেয়েও গভীরতর।' (শিক্ষা)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাদর্শনে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কে হবে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহজ। পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে গড়ে উঠবে শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা-প্রদান প্রক্রিয়া। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন – '.....গুরু করবেন বিদ্যা সৃষ্টির সাধনা, শিষ্য করবে বিদ্যা গ্রহণের সাধনা, যেখানে সম্পূর্ণভাবে দান, সেখানেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ সম্ভবপর, যেখানে অধ্যাপকগণ জ্ঞানের চর্চায় স্বয়ং প্রবৃত্ত সেইখানেই ছাত্রগণ বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়' (শিক্ষা)। রবীন্দ্রনাথের মতে, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকের সম্পর্ক হবে আদর্শস্থানীয়। তিনি মনে করতেন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক না থাকলে শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা-প্রদানের কাজ চলতে পারে না। প্রসঙ্গত তিনি লিখেছেন – 'শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। যেখানেই সেই শ্রদ্ধার সম্পর্ক নেই, সেখানে আদান-প্রদানের সম্বন্ধ কলুষিত হইয়া উঠে' (শিক্ষা)। তাই শিক্ষককে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর কর্তব্য পালন এবং শিক্ষার্থীকে শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে শিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞানার্জনের পরামর্শ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

**রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন : শান্তিনিকেতন**

গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বর্জন করে রবীন্দ্রনাথ যে নতুন শিক্ষা পদ্ধতির কথা ভেবেছেন, তা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ১৯০১ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'শান্তিনিকেতন'। শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন – 'আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, এখানকার এই প্রভাতের আলো, শ্যামল প্রান্তর, গাছপালা যেন শিশুদের চিত্ত স্পর্শ করতে পারে। কারণ, প্রকৃতির সাহচর্যে তরুণ চিত্তে আনন্দ সঞ্চারের দরকার আছে এই উদ্দেশ্যে আমি আকাশ আলোর আঙ্কশায়ী উদার প্রান্তরে এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলুম' (শান্তিনিকেতন)। প্রাচীন ভারতীয় আশ্রমিক শিক্ষার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করেছিলেন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়। প্রাচীন আশ্রমিক শিক্ষার সব বৈশিষ্ট্যই বর্তমান ছিল শান্তিনিকেতনে। শহর ছেড়ে কেন তিনি পল্লীর উদার প্রান্তরে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এভাবে–

> ভারতবর্ষের এই একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ শহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠেনি। সেখানে গাছপালা নদী সরোবর মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার অবকাশ পেয়েছিল। সেখানে মানুষও ছিল ফাঁকাও ছিল। ঠেলাঠেলি ছিল না। অথচ ফাঁকায় ভারতবর্ষের চিত্তকে জড়প্রায় করে দেয়নি, বরঞ্চ তার চেতনাকে আরো উজ্জ্বল করে দিয়েছিল। এরকম ঘটনা জগতে আর কোথাও ঘটেছে বলে দেখা যায় না। *(শিক্ষা)*

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবীক্ষণের মূল কথা হলো ব্যক্তিক বিকাশ এবং সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করা। কেবল এ প্রক্রিয়ায়ই মানুষের সার্বিক মুক্তি অর্জন সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।[১৬] অন্তঃস্থ এই প্রত্যয় থেকেই রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেছেন শান্তিনিকেতন। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে সূত্রাকারে উপস্থাপিত হলো[১৭] –

১। অবাধ স্বাধীনতা : শ্রেণিকক্ষে আবদ্ধ পরিবেশে শিক্ষাদানের পরিবর্তে এখানে মুক্ত প্রকৃতির মাঝে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াতে এবং খেলাধুলা করতে পারে। অকারণ বিধি-নিষেধের কঠোরতা এখানে নেই।

২। সাম্য : জাতিধর্মের কোনো পার্থক্য এখানে করা হয় না। ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে পড়ালেখা করে, এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ও খেলাধুলা করে।

৩। সরল জীবনযাপন : উচ্চ চিন্তা এবং সরল জীবনযাপন শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার্থীরা নিজেদের কাজ নিজেরাই করে। ঘর-বাড়ি পরিষ্কার করা, বাগান পরিচর্যা, পোষাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার করা, বাসন ধোয়া – এসব কাজ শিক্ষার্থীরা সানন্দে নিজেরাই সমাধা করে। এর ফলে তারা শ্রমের প্রতি মর্যাদা ও আত্মনির্ভরতা শেখে।

৪। গৃহ-পরিবেশ : শিক্ষার্থীরা শান্তিনিকেতনে গৃহ-পরিবেশে বাস করে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক একান্ত মধুর হওয়ার ফলে এ বিদ্যালয়ের কখনো শৃঙ্খলার অভাব দেখা দেয় না। শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে শাস্তির কঠোরতাও এখানে নেই।

৫। ভারতীয় কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিকতা : শান্তিনিকেতনে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের ভারতীয় কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে শিক্ষাদান। প্রাচীন ভারতের তপোবনের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও আশ্রমিক শিক্ষাদর্শনে প্রতিফলন শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থায় সুস্পষ্ট।

৬। সহপাঠ : শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থায় সহপাঠ্যক্রমিক কাজের প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ঋতু উৎসব, খেলাধুলা, অভিনয়, নৃত্য, সঙ্গীত, সম্মিলন, ভ্রমণ, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে শান্তিনিকেতনের শিক্ষাক্রমে। রবীন্দ্রনাথ নিজে এইসব কাজে সক্রিয়ভাবে যোগ দিতেন, গান রচনা করতেন এবং অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন।

৭। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা : শান্তিনিকেতনের আর এক উল্লেখ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, যথার্থ শিক্ষা কেবল মাতৃভাষার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। ঔপনিবেশিক যুগে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে এক সাহসী ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

৮। সময়-তালিকা ও কার্যসূচি : শান্তিনিকেতনের কাজের সময়সূচি ছিল যথেষ্ট নমনীয়। প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার্থীদের সময়-তালিকার পরিবর্তন করা এ বিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সাধারণভাবে ব্রাহ্মমুহূর্ত থেকে বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয় এবং সকাল দশটা পর্যন্ত পড়ালেখা চলে। মধ্যাহ্নভোজের পর বিশ্রাম। অপরাহ্নে শিক্ষার্থীরা সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, শারীরিক শিক্ষা, খেলাধুলা ইত্যাদি করে থাকে।

৯। শিল্প শিক্ষা: মহাত্মা গান্ধীর মতো রবীন্দ্রনাথও শান্তিনিকেতনের শিক্ষাক্রমে শিল্প কাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এ বিদ্যালয়ে নানারূপ কুটির শিল্প, তাঁত শিল্প, দারুশিল্প, মৃৎশিল্প, চামড়া শিল্প, কৃষি শিল্প ও উদ্যাম পরিচর্যার কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়।

১০। পল্লি-উন্নয়ন: সমাজসেবা ও পল্লি-উন্নয়নমূলক কাজ শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থার আর এক উল্লেখ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য। পল্লি-উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে সমাজের নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটে, নানা বিষয়ে তারা প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারে।

১১। ভাষা শিক্ষা: রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন– 'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ'। তাই বলে কেবল মাতৃভাষাই শিক্ষা দেওয়া হতো না শান্তিনিকেতনে। মাতৃভাষা ছাড়াও অন্যান্য ভাষা শিক্ষাকে তিনি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। হিন্দি, উর্দু, সংস্কৃতি, পালি, প্রাকৃত, আরবি, ফারসি প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার কথা তিনি বলেছেন। বৃহত্তর প্রাচ্য সংস্কৃতির সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য তিব্বতি এবং চীনা ভাষা শিক্ষার কথা তিনি বলেছেন; সর্বোপরি ইংরেজি ভাষা আয়ত্তের কথাও তিনি বলেছেন। প্রসঙ্গত তিনি লিখেছেন – 'আমি বাঙালি বলে আমাদের সাহিত্যরসের চর্চা কেবল বাংলা সাহিত্যের মধ্যেই পরিসমাপ্ত হবে? আমি কি বিশ্বসংসারে জন্মাই নি? আমারই জন্য জগতের যত দার্শনিক, যত কবি, কত বৈজ্ঞানিক তপস্যা করেছেন, এর যথার্থোপলব্ধির মধ্যে কি কম গৌরব আছে'? *(শিক্ষা)*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবি। শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল কবি-প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে। ঔপনিবেশিক শাসক-প্রবর্তিত প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শান্তিনিকেতন। এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের ঔপনিবেশিকতাবাদ-বিরোধী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সৃজনশীল শিক্ষাদর্শন, যার ভিত্তি ছিল প্রাচীন ভারতীয় আশ্রমিক শিক্ষাপদ্ধতি। প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য সমালোচকের নিম্নোক্ত বক্তব্য।

> It should therefore be clearly perceived that Santiniketan Ashram was born primarily as a protest against the conventional system of education. On the other hand, Rabindranath also had some doubts in his mind about the efficiency of our traditional indigenous institutions, such as Tol, Chatuspathi, Pathsala etc. in the field of our modern education in our country.[18]

**রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন : বিশ্বভারতী**

পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বিশ্বাত্মচেতনা। এই বিশ্বাত্মচেতনারই বাস্তব প্রতিফলন হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত 'বিশ্বভারতী' (১৯২১)। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার নতুন প্রয়োগক্ষেত্র হলো বিশ্বভারতী। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক উজ্জ্বল সমন্বয়ক্ষেত্র হিসেবে তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছেন বিশ্বভারতীকে।

বিশ্বভারতীর উদ্বোধনী ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেন, বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মানুষ কিভাবে পরস্পর সহযোগিতা করে বাঁচতে পারে, এই প্রতিষ্ঠান থেকে তার ধারণা পাওয়া যাবে। বিশ্বভারতীর জন্য যে সংবিধান তৈরি করা হয়েছে, সেখানেই পাওয়া যায় রাবীন্দ্রিক বিশ্বাত্রবোধের পরিচয় – প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয়ই যার মূল কথা–

(a) To study the mind of Man in its realization of different aspects of truth from diverse points of view:

(b) To bring into more intimate relation with one another through patient study and research the different cultures of the East on the basis of their underlying unity.

(c) To approach the west from the standpoint of such a unity of the life and thought of Asia.

(d) To seek to realize in a common fellowship of study the meeting of East and West and thus ultimately to strengthen the fundamental conditions of world peace through the free communication of ideas between the two hemispheres;

(e) And with such ideals in view to provide at Santiniketan a centre of culture where research into the study of the religion, literature, history, science and art of Hindu, Buddhist, Jain, Zoroastrain, Islamic, Sikh, Christian, and other civilizations may be perused along with the culture of the West, with that simplicity of externals which is necessary for true spiritual realization, in amity, good fellowship and co-operation between the thinkers and scholars of both Eastern and Western countries, free from all antagonisms of race, nationality, creed or caste and in the name of the one Supreme Being who is Shantam, Shivam, Advaitam. (Visva-Bharati)

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বিশ্বভারতী পৃথিবীর সকল জ্ঞানের সনম্বয় ঘটবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা বিশ্বভারতীতে এসে পড়ালেখা করবে – বিশ্বাত্মবোধে একাত্ম হয়ে সম্মিলনী সভ্যতার মহা অর্ণবে তারা অবগাহন করবে। এই প্রত্যয় ব্যক্ত করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

> 'We can work together in a common pursuit of truth, share together our common heritage, and realize that artist in all parts of the world have created forms of beauty, scientists discovered secrets of the universe, philosophers solved the problems of existence, saints made the truth of the spiritual world organic in their own lives, not merely for some particular race to which they belonged, but for mankind'. (An Eastern University).

১। শিশুভবন (নার্সারি স্কুল)
২। পাঠভবন (মাধ্যমিক বিদ্যালয়)
৩। শিক্ষাভবন (উচ্চ-মাধ্যমিক)
৪। বিদ্যাভবন (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর)
৫। বিনয়ভবন (শিক্ষক-প্রশিক্ষণ)
৬। কলাভবন (শিল্প ও চারুকলা)
৭। সঙ্গীতভবন (সঙ্গীত ও নৃত্য)
৮। শ্রীনিকেতন (পল্লি-উন্নয়ন)
৯। শিক্ষাসূত্র (গ্রাম-বিদ্যালয়)
১০। শিল্পসদন (শিল্পশিক্ষণ)
১১। চীনাভবন (চীনা, তিব্বতি ইত্যাদি ভাষা-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান)।

– বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের, এইসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের যুগান্তকারী শিক্ষাদর্শন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃথিবীর সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদার্শনিক। আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষাতত্ত্বের উদ্ভাবক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতের শিল্প ও কৃষ্টির সঙ্গে পাশ্চাত্যের শিল্প ও বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর অমর শিক্ষাতত্ত্ব। তাঁর শিক্ষাভাবনার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি যেমন দেশীয় শিক্ষারীতিকে সমকালের উপযোগী করে নিয়েছেন, তেমনি নিজের ভাবনার সঙ্গে মিলে গেলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদদের ভাবনাকেও শিক্ষাক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন। সমকালীন ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তক ও শিক্ষাচর্চাবিদ হিসেবে তাঁর নাম ও কীর্তি তাই অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা সে-অর্থে যেমন মৌলিক, তেমনি অন্যদের ভাবনার সংশ্লেষ ও আত্তীকরণও বটে।[১৯] প্রসঙ্গত স্মরণীয় হিমাংশুভূষণ মুখার্জীর নিম্নোক্ত বিশ্লেষণ–

> Tagore was no more entirely 'original' than great educators like Plato, Bacon, Lacoke, Rousseau and Deway, because he reflected, as much as they, some past or contemporary thought...Tagore's educational ideas had deep and powerful roots and did not originate, as it were, in mind-air. In fact, we have made the point in an earlier context that it is one of the great merits of Tagore's educational thought that it reflected within a single compass, so much of the best educational thoughts of the world.[20]

**তথ্যনির্দেশ**

১। চ্যাটার্জী, সরোজ, আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের রূপায়ণ (কলকাতা: নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ ২০০০), পৃ. ৪৫৬।
২। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, রবীন্দ্র-সমীক্ষা (কলকাতা: দে'জ পাবলিশি, ২০০৫), পৃ.১১।
৩। পূর্বোক্ত, পৃ.১৬-১৭।
৪। ঘোষ, বিশ্বজিৎ,কথাগুচ্ছ গুচ্ছকথা (ঢাকা:গ্লোব লাইব্রেরী প্রা. লিমিটেড,২০০৩),পৃ. ২৯।

৫ । হোসেন, সৈয়দ আকরম, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস: চেতনালোক ও শিল্পরূপ (ঢাকা: একুশে পাবলিকেশন্স, ২০০১), পৃ.১১ ।

৬। Tagore, Rabindranath,:"A Poet's School' in Pionner in Education (London: John Murray, 1961), P. 50.

৭। নন্দী, সুধীরকুমার, দর্শন-জিজ্ঞাসা (বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫), পৃ. ৭০ ।

৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪ ।

৯। চ্যাটার্জী, সরোজ, পূর্বোক্ত (পাদটীকা নম্বর ১), পৃ. ৪৫৭ ।

১০। Woodrow, H., Macaulay's Minutes on Education in India (Calcutta: Co's Prees, 1862), P.115. উদ্ধৃত: বিনয় ঘোষ, বাংলার বিদ্বৎসমাজ (কলকাতা: প্রকাশ ভবন, ১৯৭৮), পৃ.৪০

১১। ঘোষ, বিশ্বজিৎ, বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ (ঢাকা : বাংলা-একাডেমী, ১৯৯৭), প.৪২ ।

১২। রায়, সুশীল, শিক্ষাতত্ত্ব (কলকাতা: সোমা বুক এজেন্সী, ২০০৩), পৃ. ৪১৮ ।

১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তোতাকাহিনী' শীর্ষক রচনাটি বর্তমান প্রবন্ধসূত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয় ।

১৪। রায়, সুশীল, পূর্বোক্ত (পাদটীকা নম্বর ১২). পৃ. ৪২০ ।

১৫। চক্রবর্তী, যোগেশচন্দ্র, শিক্ষাতত্ত্বের গোড়ার কথা (কলকাতা: উষা পাবলিশিং হাউস, ২০০১), পৃ. ২১৪ ।

১৬। মাসুদুজ্জামান, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিক্ষাভাবনা (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬), পৃ. ১০১ ।

১৭। সরোজ চ্যাটার্জী, পূর্বোক্ত (পাদটীকা নম্বর ১), পৃ. ৪৬০-৬১ ।

১৮। Tagore, Supriyo, "Rahindranath's Philosophy of Education" in Patha Bhavana: A Poet's School (Santiniketan: Visva-Bharati, 1994), P.18

১৯। মাসুদুজ্জামান, পূর্বোক্ত (পাদটীকা নম্বর ১৬), পৃ ১৩৪ ।

২০। Mukherjee, Himangsu Bhusan, Education for Fulness: A Study of the Educational thought and Experiment of Rabindranath Tagore (Bombay: Asia Publishing House. 1962). P. 441.